# টাকার বাজারে টাকা নেই

## ১৬% সুদ দিয়েও টাকা টানতে পারছে না ব্যাংকগুলো

**অর্থনৈতিক রিপোর্টার :** সরকার চালাতে টাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিনিয়োগের জন্যও। উন্নয়নের জন্যও চাই টাকা। জাতীয় নিরাপত্তা ও জনস্বস্তির জন্যও টাকার প্রয়োজন। অথচ টাকার বাজারে টাকা নেই। ব্যাংকগুলো ১৬ শতাংশ হারে সুদ দিয়েও অর্থবাজারে টাকা টেনে আনতে পারছে না। অথচ কয়েক বছর আগেও ব্যাংকগুলোয় ৩৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি অলস অর্থ জমেছিল। সুদের হারও ছিল কম।

মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে দৃশ্যপট পাল্টে গেল। তারল্য উদ্বৃত্ত বাজারে দেখা দিল তারল্য ঘাটতি। অন্যদিকে তারল্য প্লাবিত পুঁজিবাজারেও ভাটার টান পড়লো। সৃষ্টি হলো খরা পরিস্থিতির। অর্থ ও পুঁজিবাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাই চলতি এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। দায়ী সরকারও। সরকার যথাযথ অবস্থানে যথাযথ লোক নিয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু সম্পদ জড়ো না করে ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে মাত্রাতিরিক্ত ঋণ নিয়েছে। ফলে সর্বত্র তারল্য সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাবে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বত্র অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি সেনাবাহিনীতেও অস্থিরতার সংক্রমণ ঘটেছে। সেনা কর্তৃপক্ষ অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষমও হয়েছে।

অর্থনৈতিক সঙ্কট ও উন্নয়নকে পাশ কাটিয়ে চলার প্রবণতাই উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী। সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি রোধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানোর বিষয়টি খুবই জরুরি। জরুরি হলো টাকা বাজারে টাকার প্রবাহ বৃদ্ধি। পুঁজিবাজারে পুঁজির ব্যাপক সমাবেশ ঘটানো। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কাজটি সম্পন্ন করতে একটু বেগ পেতে হবে। তবে সরকার আন্তরিক হলে পরিস্থিতি দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার আন্তরিক– এ বার্তাটি পেলেই অর্থ ও পুঁজিবাজারে বসন্তপ্রবাহ ধরা দেবে। এজন্য প্রয়োজন অর্থ ও পুঁজিবাজারের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নেয়া বাজারমুখী পদক্ষেপগুলোকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া। বাজারের অপশক্তিগুলোকে দ্রুত সরিয়ে নেয়া।

এ মুহূর্তে অপশক্তিগুলো জড়ো হয়েছে কুউদ্যোক্তাদের বলয়ে। কুউদ্যোক্তোদের নীলনকশা বাস্তবায়নে ১০০ কোটি টাকার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ১০০ কোটি টাকার ভাগ-বাটোয়ারার অংশবিশেষ যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে বাজারে গুঞ্জন রয়েছে। বাজারে গুঞ্জন রয়েছে, ১০০ কোটি টাকার তহবিলের নীলনকশা বাস্তবায়িত হলে কুউদ্যোক্তারা সস্তায় এক হাজার কোটি টাকার শেয়ার হাতিয়ে নিতে সক্ষম হবে। হাতিয়ে নেয়া ১ হাজার কোটি টাকার শেয়ার পরে চড়া মূল্যে বিক্রি করে আরো কয়েক হাজার কোটি টাকা হাতানোর মতলবে রয়েছে তারা। এ ধরনের গুঞ্জন শক্তিশালী পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

বাজার ব্যবস্থাপক এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উচিত উল্লিখিত গুঞ্জনকে আমলে নিয়ে সে ধরনের অপপ্রয়াস রোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেই সাথে অবাধ পুঁজি প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা। একই ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে অর্থবাজারেও। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরে জাতীয় উন্নয়নবিরোধী অপশক্তি ঘাপটি মেরে বসে আছে, যে অপশক্তিগুলো অবাধ অর্থপ্রবাহের সুযোগ নষ্ট করে দিচ্ছে। ভয়ভীতির বিস্তার ঘটিকে ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে টাকা তাড়িয়ে দিচ্ছে। ব্যাংকিং চ্যানেলের টাকা গিয়ে জমা হচ্ছে জমিতে, ডলারে। ডলারে রূপান্তরিত টাকার একাংশ আবার বিদেশে পাচার হচ্ছে। এতে রাষ্ট্র বহুমুখী সঙ্কটের ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে। আমানত সুদ ১৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ১৬ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার সংগ্রাম খুবই কঠিন হবে। এক্ষেত্রে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কটকে স্বীকার করে নিয়েই এর সমাধানের জন্য বাস্তবসম্মত টেকসই জাতীয় কৌশল নির্ধারণ করতে হবে এবং সে কৌশল বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

গত ২৩ জানুয়ারি সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ অবিলম্বে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। রাজধানী ঢাকার রাওয়া ক্লাবে জাতীয় নিরাপত্তার কৌশলপত্র বিষয়ক এক সেমিনারে তিনি উল্লিখিত পরামর্শ দেন।

সেমিনারে জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা, উন্নয়নকে মূল উপজীব্য রেখে জাতীয় নিরাপত্তার কৌশলপত্র

প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লে. জেনারেল জহিরুল আলম। মূল প্রবন্ধে তিনি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের গঠন কাঠামো উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় বক্তারা কৌশলপত্রের মূল লক্ষ্য উন্নয়নকেন্দ্রিক করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তাদের মতে, উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রা পেলে সব ধরনের অভ্যুত্থান আশঙ্কা রহিত হয়ে যায়। তারা আরো মনে করেন, রাষ্ট্রের অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়ন রাষ্ট্রকে ঝুঁকিমুক্ত করবে। সেমিনারে সাবেক সেনাপ্রধানদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের ইস্যু বা প্রস্তাব নতুন নয়, পুরনো। পুরনো ইস্যুটিই আবার নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ইস্যুটির নিষ্পত্তির জন্য রাজনীতিবিদের ঐকমত্য প্রয়োজন। জাতীয় উন্নয়ন এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতেও রাজনীতিবিদের ঐকমত্য এবং সদিচ্ছার প্রয়োজন। প্রয়োজন জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিবিদদের এগিয়ে আসা। অথচ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর নিষ্পত্তিতে রাজনীতিবিদদের আগ্রহ কম। বরং জাতিকে বিভক্ত রাখার ক্ষেত্রে আগ্রহ বেশি। ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কটসহ জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার সঙ্কটও বাড়ছে, বাড়ছে জাতীয় অস্থিরতা বৃদ্ধির সঙ্কটও। এ ধরনের পরিবেশ বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সম্ভাবনার জায়গাগুলোকে সংকুচিত করে দেয়। বাংলাদেশে ৮ বছর ধরে বিনিয়োগ স্থবিরতা চলছে। এ স্থবিরতা দ্রুত দূর হওয়া প্রয়োজন।

বিনিয়োগ স্থবিরতা দূর করার জন্য অনুকূল পরিবেশ নির্মাণ করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। এটা তাদের করতে হবে। একই সাথে জাতীয় সংকট উত্তরণের জন্য জাতীয় সম্পদ জড়ো করে আত্মনির্ভর জাতীয় বাজেট প্রণয়নে উদ্যোগী হতে হবে। জাতীয় সম্পদ জড়ো করার অন্যতম দুটি উৎস হলো অর্থ ও পুঁজিবাজার। এ দুটি বাজারে সার্বিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এ বাজারের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কর আদায়বান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে। জনগণকে কর দিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নচেৎ জাতীয় অর্থনীতির সূচকগুলোর পাতাল অভিমুখী যাত্রা রোধ করা যাবে না।

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক মেয়াদি মুদ্রানীতি প্রকাশ করেছে। নতুন মুদ্রানীতি উন্নয়ন ও বিনিয়োগ পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত গতি বৃদ্ধি করতে পারবে না। এ মুদ্রানীতি সুদ হার আরো বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করবে। ফলে বিনিয়োগ বাজার সংকুচিত হয়ে পড়বে। দেশীয় শিল্পগুলোর ভিত দুর্বল হয়ে যাবে। পুঁজিবাজারও নতুন করে তারল্য সঙ্কটের মুখে পড়বে। এমনিতেই দেশীয় পুঁজিবাজারে তারল্য সঙ্কট চলছে। গত সপ্তাহেও দেশীয় পুঁজিবাজারের সব সূচক আরো নিচে নেমে গেছে।

দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তার তিনটি মূল্যসূচকেরই আরো অবনতি ঘটিয়েছে। ফলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ মূল্যসূচকের সর্বোচ্চ ৮ হাজার ৯১৯ পয়েন্ট থেকে গত বৃহস্পতিবার ৪ হাজার ৪৮৭ পয়েন্টের ঘরে নেমে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সাধারণ মূল্যসূচক হারিয়েছে ৪ হাজার ৪৩২ পয়েন্ট। পতনহার ৪৯.৬৯ শতাংশ।

প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী লেনদেন সঙ্কুচিত হয়েছে ৯৪.১৬ শতাংশ এবং বাজার মূলধনের আকার খাটো হয়েছে ৩৬.২৩ শতাংশ। মাত্র ১৪ মাসের ব্যবধানে পুঁজিবাজার এভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে। ৮ হাজার ৯১৮ এমনকি ৯ হাজার সূচক অবস্থানে যে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার কিনতে বুক কাঁপেনি আজ সে বিনিয়োগকারী ৪ হাজার ৪৮৭ পয়েন্টের ঘরে শেয়ার কিনতে আস্থা পাচ্ছে না। এমনকি যারা ৮ হাজার ৯১৮ পয়েন্ট এমনকি ৯ হাজার পয়েন্টের সূচক অবস্থানে শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে সরে গেছে সেও বর্তমান বাজারে শেয়ার কিনতে আস্থাশীল হতে পারছে না। অথবা শেয়ার কিনতে আগ্রহী হচ্ছে না।

শেষোক্তদের মধ্যে উদ্যোক্তাদের একটি বড় অংশ রয়েছে। যারা পুঁজিবাজারে পরিকল্পিত মূল্য উলম্ফন ঘটিয়ে শেয়ার বিক্রি করে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করেছে। তারাই আবার পরিকল্পিত ধস নামিয়ে বাজার থেকে নামমাত্র মূল্যে শেয়ার হাতিয়ে নেয়ার নীলনকশা বাস্তবায়নের ১০০ কোটি টাকার 'ম্যানেজ ফান্ড' নিয়ে মাঠে নেমেছে বলে বাজারে গুঞ্জন রয়েছে। কুউদ্যোক্তাদের এ নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় সর্বস্ব হারিয়ে জীবন্ত লাশ হয়ে পুঁজিবাজার এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্বস্ব হারানোদের কিছু লোক গত সপ্তাহে ডিএসইর সামনে প্রতীকী লাশ

নিয়ে মিছিল করেছে। বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। রাস্তায় আগুন ধরিয়েছে। এমনকি স্টক এক্সচেঞ্জেও আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে। সরকার পুলিশি ব্যবস্থায় তাদের নিয়ন্ত্রণ/শায়েস্তা করেছে। তবে পুলিশি ব্যবস্থা সূচক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। পারবেও না। বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ নির্মাণের মাধ্যমেই সূচক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়ন না ঘটার কারণে গত সপ্তাহে ডিএসইর সাধারণ মূল্যসূচক আরো ৪৫৯.৫১ পয়েন্ট কমেছে। বাজার মূলধনের আকার সঙ্কুচিত হয়েছে ১৭২২ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। ডিএসইর ওয়েটেড অ্যাভারেজ পিই অনুপাত ১১.৮১ অনুপাতে নেমে আসার পরও বাজার ক্রেতা আনুকূল্য পায়নি। এক অংকের পিই অনুপাতে নেমে আসাকে ব্যাংকিং খাতের পয়েন্ট এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোও কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা আকর্ষণ করতে পারেনি। এমনকি দর বৃদ্ধির শীর্ষ দশ তালিকাও পূরণ করতে পারেনি। দর বৃদ্ধির শীর্ষ দশ তালিকায় মাত্র ছয়টি নাম ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল আইবিবিএলপি বন্ড, একটি জীবনবীমা কোম্পানীর শেয়ার, দুটি মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং দুটি কোম্পানীর শেয়ার। বাকি ৪টি ঘর ফাঁকা ছিল। উল্লিখিত ছয়টি ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে দুটি ইনস্ট্রুমেন্ট পিই আওতা বহির্ভূত। বাকি চারটি ইনস্ট্রুমেন্ট লেনদেন হয়েছে ১০.৬৭ গড় পিই অনুপাতে।

লেনদেনের শীর্ষ ১০ তালিকায় স্থান করে নেয়া শেয়ারগুলো লেনদেন হয়েছে ১৯.৭৭ গড় পিই অনুপাতে। লেনদেনের শীর্ষ ১০ তালিকার শীর্ষ অবস্থান দখল করে বেক্সিমকো লিমিটেডের শেয়ার। এ কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন হয় ৩.১৭ পিই অনুপাতে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা গ্রামীণফোনের শেয়ার লেনদেন হয় ১৯.৮৯ পিই অনুপাতে। তৃতীয় অবস্থানে থাকা আর এন স্পিনিংয়ের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ১৩.০৯ পিই অনুপাতে। চতুর্থ অবস্থানে থাকা ইউনাইটেড এয়ারের শেয়ার লেনদেন হয় ১৫.১০ পিই অনুপাতে। পঞ্চম অবস্থানে থাকা এনবিএলের শেয়ার লেনদেন হয় ৮.১০ পিই অনুপাতে। ষষ্ঠ অবস্থান দখল করা এসআইবিএলের শেয়ার লেনদেন হয় ১২.০৮ পিই অনুপাতে। সপ্তম অবস্থানে থাকা যমুনা অয়েলের শেয়ার লেনদেন হয় ১৬.৫৯ পিই অনুপাতে। অষ্টম অবস্থান দখল করা বীকন ফার্মার শেয়ার লেনদেন হয় ৫৭.৯৬ পিই অনুপাতে। নবম স্থান দখল করা ইউসিবিএলের শেয়ার লেনদেন হয় ১৫.১০ পিই অনুপাতে এবং ফু-ওয়াং সিরামিকের শেয়ার লেনদেন হয় ৩৭.১৮ পিই অনুপাতে। মোট লেনদেনের শীর্ষ দশের অংশ ছিল ২৭.৩৫ শতাংশ।

খাতভিত্তিক লেনদেন তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় আটটি খাতের ৭৭.৯৯ শতাংশ লেনদেন সম্পন্ন হয় ১৪.৬০ পিই অনুপাতে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২২.২৭ শতাংশ শেয়ার লেনদেন হয় ব্যাংকিং খাতের যার পিই অনুপাত ৮.৬৮। লেনদেনে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল বস্ত্রখাতের শেয়ার। বস্ত্রখাতের পিই অনুপাত ১৮.০৩। লেনদেনে চতুর্থ অবস্থানে ছিল লিজিং খাতের শেয়ার। লিজিং খাতের পিই অনুপাত ১০.৯২। লেনদেনে পঞ্চম অবস্থানে ছিল ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের শেয়ার। ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের শেয়ার লেনদেন হয় ১৯.৯২ পিই অনুপাতে। লেনদেনে ষষ্ঠ অবস্থানে ছিল বীমা খাতের শেয়ার। বীমা খাতের পিই অনুপাত ১৮.৩১। লেনদেনে সপ্তম অবস্থানে ছিল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের শেয়ার। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের শেয়ারের পিই অনুপাত ১২.১৭। লেনদেনে অষ্টম অবস্থানে ছিল বিবিধ খাতের শেয়ার। বিবিধ খাতের পিই অনুপাত ৬.৬৮।

মোট লেনদেনের ৩০.৪৬ শতাংশ সম্পন্ন হয় ৬.৯৪ পিই অনুপাতে। এর মধ্যে ব্যাংকিং খাতের লেনদেন অংশ ছিল ২২.২৭। পিই অনুপাত ৮.৬৮। ৬.১৩ শতাংশ লেনদেন ছিল বিবিধ খাতের শেয়ারের। বিবিধ খাতের শেয়ারের পিই অনুপাত ৬.৬৮। মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন অংশ ২.০৬ শতাংশ। মিউচ্যুয়াল ফান্ডের পিই অনুপাত ৫.৪৭।

.xxxxxxxxxxxxx